Website: https://www.parthasarathipatrika.com

৩৭ তম অন্তর্জাল সংখ্যা

১০ই বৈশাখ, ১৪৩০ / 24.04.2023

-: সম্পাদক :-

সুনন্দন ঘোষ

DO NOT COPY

-: সূচীপত্র :-

প্রীতি-কণা	শ্রী প্রীতিকুমার ঘোষ
আমাদের কথা	সম্পাদকীয়
পার্থসারথির জন্মদিনে	শ্রীমতী শুক্লা ঘোষ
ভক্ত বৎসল শ্রীরামকৃষ্ণ	শ্রী প্রণব ঘোষ
জ্ঞানতাপস্বী অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ	শ্রীদীপঙ্কর নন্দী
বোধিসত্ত্বের অপেক্ষায়	শ্রী সুনন্দন ঘোষ

PARTHASARATHI: RNI 5158/ 60 for print format: converted to e-magazine by
Publisher: Sunandan Ghosh during prolonged Nationwide Lockdown in 2020.
Website: https://www.parthasarathipatrika.com
Contact: 182 Jessore Road, Flat- D1, Kolkata- 700074. WhatsApp: 9433284720

DO NOT COPY

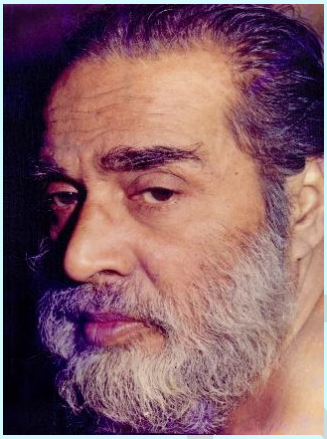

(১০.০৩.১৯২৬ - ২৪.১১.১৯৮৬)

প্রীতি কণা

"আমাদের জীবনের মূল লক্ষ্য হলো ধর্ম, সেবা ও ত্যাগ। সেবা হবে প্রেম ও শ্রদ্ধার সাথে। ধর্ম-জীবন ও সেবা – এই দুটি দিয়ে গড়ে তুলতে হবে প্রথমে নিজের জীবন, তারপর নিজ নিজ সংসার, গোষ্ঠী ও সমাজ, দেশ। নিজের জীবনকে প্রথমে পবিত্র ও শুদ্ধ সেই সঙ্গে প্রেমময় করে তুলতে হবে।"

DO NOT COPY

আমাদের কথা

কোভিডের ভয়াবহ দিনগুলো আজ স্মৃতি। এই বিশাল দেশের প্রতি কোণে আজকের প্রাণোচ্ছল জীবনের গতি দেখলে বোঝা যায়না সদ্য অতীত হয়ে যাওয়া দিনলিপির পাতায় পাতায় খোদিত আছে ক্ষুধা-মুনাফা-প্রতারণা আর ত্যাগ-তিতিক্ষা-সংগ্রামের দ্বান্দ্বিক ইতিহাস।

কোভিডের অকল্পনীয় দ্রুতগতির বিস্তার প্রতিরোধ করেছিল দেশব্যাপী লকডাউন। হঠাৎ চাপিয়ে দেওয়া লকডাউন অনেক অনভিপ্রেত সমস্যার জন্ম দিয়েছিল ঠিকই, কিন্তু বন্ধ দুয়ারে কড়া নেড়ে যাওয়া যমদূতেরা এই বিশাল জনসংখ্যার দেশে প্রায় খালি হাতে ফিরতে বাধ্য হয়েছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ, শ্রী অরবিন্দের ভাবধারা অনুসরণ করে গীতারত্ন শ্রীপ্রীতিকুমার ১৯৬০ সালে প্রবর্তন করেছিলেন পার্থসারথি ধর্ম ও জাতীয়তাবাদী বাংলা মাসিক পত্রিকা। বাংলা ক্যালেণ্ডার অনুসারে প্রতিমাসে প্রকাশিত হত রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক স্বীকৃত এই পত্রিকা। লকডাউনের অভাবনীয় পরিস্থিতিতে প্রকাশনাকে নিরবচ্ছিন্ন রাখতে এপ্রিল, ২০২০ অর্থাৎ বৈশাখ, ১৪২৭ সন থেকে ছাপা পত্রিকা আধুনিক প্রযুক্তির প্রয়োগে রূপান্তরিত হল বৈদ্যুতিন পত্রিকা বা e-magazine- এ।

এই বৈশাখ, ১৪৩০ অর্থাৎ 24th April, 2023-এ ৩৭ তম সংখ্যার মাধ্যমে পার্থসারথির অন্তর্জাল প্রকাশ পা রাখছে চতুর্থ বছরে। আর সামগ্রিক ভাবে এই পত্রিকার বয়স এখন ৬৩ বছর।

ছাপার বই পড়ায় যাঁরা অভ্যস্ত, তাঁরা জিজ্ঞাসা করছেন পত্রিকাকে আবার আগের রূপে ফিরিয়া আনা যায় কিনা।

যে কোন রেজিস্টার্ড পত্রিকা মুদ্রিত রূপে নিয়মিত প্রকাশ করতে গেলে অনেকগুলো জটিল আইনি পর্যায় পেরোতে হয়, অনেক শর্তাবলী পালন করতে হয়।

DO NOT COPY

ওয়েবসাইটে প্রকাশনার পদ্ধতি এবং নিয়মাবলী আলাদা। ওয়েবসাইট তৈরির ব্যয়ভারও যথেষ্ট। কাজেই এখন আগের রূপে ফিরে যাওয়া কঠিন।

দ্বিতীয়তঃ ই-পত্রিকা প্রকাশনায় সম্পাদক-প্রকাশক যদি কম্পিউটারে একটু সড়গড় থাকেন, তাহলে তার কাজের অবাধ সুযোগ। টাইপ করা, ছবি বসানো, লেখা সাজানো, অলংকরণ, সব-ই তাঁর নিয়ন্ত্রণে। এর জন্য বিপুল পরিশ্রম হয় ঠিকই, কিন্তু সামাজিক দায়িত্ব পালনের তৃপ্তিটাও কম নয়।

তৃতীয়তঃ এখনকার প্রজন্ম ডিজিটাল বই পড়ায় অভ্যস্ত। পরবর্তী প্রজন্মের যারা ছাপা বই উল্টে দেখত না, পার্থসারথি মানে গুরুগম্ভীর ধর্মের বই, এটাই ছিলো যাদের স্বাভাবিক মনোভাব, তারা এখন অন্তর্জাল সংখ্যার পাতা স্ক্রল করছে। ডিজিটাল পার্থসারথি নীরবে তাদের মোবাইল থেকে মনে ঢুকে পড়ছে।

চতুর্থতঃ পার্থসারথি এখন অনায়াসে, মুহূর্তের মধ্যে বিদেশেও পাঠানো হচ্ছে। যাঁরা দেশে থাকুন, বিদেশে থাকুন, প্রতিটি দিন কোন না কোন ভাবে শ্রীপ্রীতিকুমারকে স্মরণ করেন, তাঁদের কাছে পত্রিকার প্রতিটি সংখ্যা এখন সহজলভ্য। পৃথিবীর যে কোন প্রান্ত থেকে যে কেউ যখন খুশী পার্থসারথির যে কোন অন্তর্জাল সংখ্যা পড়তে পারেন। ওয়েবসাইটের মাধ্যমে শ্রীপ্রীতিকুমারের অন্যান্য বইগুলিও তাঁরা প্রয়োজনমত ডাউনলোড করতে পারেন।

"The old order changeth yielding place to new
And God fulfils Himself in many ways,
Lest one good custom should corrupt the world."

-- (Alfred Lord Tennyson)

যুগ বদলায়, প্রযুক্তি বদলায়, বদলায় না মানুষের স্বধর্ম - মানবধর্ম। দেশপ্রেমের আদর্শকে অন্তরে রেখে ধর্মের গ্লানি মোচন করে সমাজের কল্যাণ সাধন করতে পার্থসারথি তার সীমিত সাধ্য নিয়ে সদা সক্রিয় রয়েছে।

জয়তু শ্রীপ্রীতিকুমার! জয়তু পার্থসারথি!

DO NOT COPY

পার্থসারথির জন্মদিনে **শ্রীমতী শুক্লা ঘোষ**

(লেখিকার এই রচনা প্রকাশিত হয়েছিল পার্থসারথির আষাঢ়, ১৩৯৭ সংখ্যায়, অর্থাৎ প্রায় ৩৩ বছর আগে। তখন যাঁরা মুদ্রিত পত্রিকার গ্রাহক ছিলেন, তাঁদের পরবর্তী প্রজন্ম এখন এই অন্তর্জাল পত্রিকার নিয়মিত পাঠক পাঠিকা। ব্যক্তিগত আলোচনায় টুকরো টুকরো কথার মাধ্যমে পুরনো দিনগুলোকে জানবার সহজ সুযোগ সবাই পান না। মূলতঃ তাঁদের জন্যই স্মৃতিচারণামূলক লেখা পুনঃপ্রকাশের আয়োজন। ঘটে যাওয়া অনেক ঘটনার এখন প্রাসঙ্গিকতা নেই। কিছু ঘটনা প্রকাশিত হলে উত্তরাধিকারীদের পক্ষে অনর্থক বিড়ম্বনার কারণ ঘটে। সেই সব ক্ষেত্রে সম্পাদকের উপর দায়িত্ব বর্তায় তার জ্ঞানবুদ্ধি মত সম্পাদনা করার। -- সম্পাদক)

আমাদের 'পার্থসারথি'র তিরিশ বছর পুর্ণ হল। এই আষাঢ়ে সে একত্রিশ বছরে পদার্পণ করবে। এর শুভানুধ্যায়ী পাঠকবৃন্দকে আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

কৃতজ্ঞতা জানাবার তালিকায় অনেকে আর এবার নেই। সংখ্যা কমে যাচ্ছে। শ্রীপ্রীতিকুমার যাঁদের সামনা সামনি বলতে পারছেন না, "ঠিক আছে, হয়ে যাবে ..." তাঁরা আর পার্থসারথির জন্য হাত উপুড় করেন নি। আর কেনই বা করবেন? তাঁরা যদি শ্রীপ্রীতিকুমারকে লোক দেখানো ভক্তি করাটা বাদ দিতেন আমার শান্তি হত। অবশ্য আমার শান্তির কথা আর কে ভাবে?

এবার আমি প্রথমেই প্রেসের অধিকর্তা বিরাজবাবু ও রথীনবাবুর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই। এই দুজন ভদ্রলোক কখনই টাকার তাগাদা তো দেনই না, ছাপা খরচ দুচার মাস বাকি পড়ে গেলেও বোধহয় রাগ করবেন না। শ্রীসুনন্দন ঘোষ যদি প্রুফ দেখবার সময় না পান (বর্তমানে তিনি এসব কাজে খুব সময় দিতে পারছেন না, আগের মতো), বিরাজবাবুরাই প্রুফটা দেখে দেন। আমার বিশ্রী হাতের লেখাটার

সাথে তাঁদের একেবারেই পরিচিতি নেই, কারণ আমি তো তাঁদের কাছে কোন চিঠিপত্র লিখিনি, তাই ছাপার কিছু কিছু শব্দ "উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে" হয়ে যায়। তবু এই যে সময় মতো পার্থসারথি ছাপিয়ে বের করা, তার জন্য তাঁদের নিষ্ঠা তো আছেই।

এরপর আমি নাম করবো রেখা শিকদারের। সুদূর জার্মানী থেকে সে যে কিভাবে আমাদের ভরসা দেয়, সাহায্য করে, তা চিন্তা করা যায় না। তার মন প্রাণ এই বাড়িটাতে পড়ে থাকে। এটাও ঠিক শ্রীপ্রীতিকুমারের শেষ জীবনে সে যা আশীর্বাদ পেয়েছে, তা বিরল। আমি যদি শ্রীপ্রীতিকুমারের ব্যক্তিগত লেখা না পড়তাম কোনও দিনও জানতে পারতাম না। অত দূরে থাকলেও রেখা আমার অতি কাছের, অতি আপন।

এছাড়া আধ্যাত্মিকতার পথে আমাকে যে সবচেয়ে সহায়তা করে সে আমার ভগ্নীসমা ডঃ কেয়া মুখার্জী। জামাইবাবুর প্রতি তার যে কি শ্রদ্ধা তা প্রকাশ করা যায়না। আমি বাপীর উপর রাগলে দুজন আমাকে ফেরাতে পারে - কেয়া ও মীরা (ডঃ মীরা আগরওয়াল)। মীরাকে না জিজ্ঞেস করে আমি কোনও সিদ্ধান্তে চট করে আসিনা।

পার্থসারথি প্রকাশনার ক্ষেত্রে আর যাদের অবদান আছে তাদের মধ্যে মনু, গীতাদি এরা আছেই। আর আছে ভাজনদার দুই মেয়ে সুমিতা ও মিঠু। কিছু না হলেও বছরে একশো টাকা অন্তত ওরা জেঠুর নামে পার্থসারথির জন্য দিয়ে থাকে। সেটুকুই বা কে করে? ছিলেন তো অনেকে, যাঁরা আমাদের দিনের সময় ও রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছিলেন।

নীরেনদার কথা নতুন করে আর লেখবার নেই। নীরেনদার উপস্থিতিটাই আমাদের কাছে অনেক। এবার কিশোরের কথাতে না আসলেই নয়। তিনি পার্থসারথির জন্য কিছুই করেন নি, কারণ ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও করে উঠতে পারেন নি। তবে ব্যক্তিগত ভাবে "মামীমার" অসুবিধাগুলি তিনি দূর করার চেষ্টা করেন। আমি তাতেই কৃতজ্ঞ। তার আরেকটি বোন সদ্য পার হয়েছে। বাকী আছে মাত্র আর

DO NOT COPY

একজন। সেটি হয়ত একটু সময় নেবে। কারণ ভগবান সব সুখ একসাথে দেন না। তিনি কোথাও না কোথাও একটু ফাঁক রেখে দেনই। এটা আমার গত সাড়ে তিন বছরের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান।

এবার আসি শ্রী সুখদাচরণ মজুমদারের প্রসঙ্গে। তিনি বরাবরই আমাদের শুভার্থী ছিলেন। আমি এখনও তাঁকে আমাদের বন্ধু বলেই মনে করি। দীর্ঘদিন অনুপস্থিত থাকবার পর তাঁর নতুন করে যোগাযোগটা আমাকে উদ্দীপিত করেছিল। তাঁর দীর্ঘদিনের নীরবতাতেও আমি ভেঙ্গে পড়িনি। কারণ তাঁর সততা ও দৃঢ়তা সম্বন্ধে আমার যথেষ্ট আস্থা আছে।

অর্থনৈতিক সুবিধার জন্য আমি কাউকে অনুরোধ করতে পারি না।

এবার আমি কৃতজ্ঞতা জানাই শ্রীপ্রীতিকুমারের কাছে, যিনি এত বছর একসাথে বাস করেও আমার মতো মহিলাকে বদলে দিতে পারেন নি। আমাকে স্পষ্টভাষিণী অনমনীয় করে রেখে গেছেন। অথচ গত চার বছরে একটি ঘরের কোণকে ভালোবাসতে শেখালেন। আমার একটা বিশ্বাস জন্মে গেছে আমি পার হবই। ভবসাগর পেরোবার আগে এই বিপদসাগর পার হয়ে যাব।

এখন তো আর পার্থসারথির ফাণ্ডে কেউ নিয়মিত টাকা পয়সা দেন না। তা সত্ত্বেও তো আমি পার্থসারথি প্রকাশ করতে পারছি। এটা শ্রীপ্রীতিকুমারের আশীর্বাদ ছাড়া সম্ভব হত না।

শ্রীপ্রীতিকুমার সশরীরে থাকাকালীন নীহারদি তাঁর ভক্ত। কিন্তু দুজনে কোনদিন মুখোমুখি হন নি। শ্রীপ্রীতিকুমারকে তিনি "গুরুদেব" বলেই সম্বোধন করেন। আমিও মাঝে তার প্রতি আসক্ত হয়েছিলেম। কিন্তু বর্তমানে নীহারদি কবিতার বুলেট তৈরি করছেন। অসুস্থ অবস্থায় শয্যাশায়ী হয়ে শুধু কবিতা লিখে যাচ্ছেন। তাঁর বন্ধু যাঁরা তাঁকে চিঠি দিচ্ছেন, তাঁদেরও রীতিমত কবিতার চিঠিতে উত্তর দিচ্ছেন। আমাকেও এরকম দুটি কবিতা বুলেট উপহার দিয়েছেন। আমি কবিতাটা একেবারেই রপ্ত করতে পারিনা। কবি বন্ধু আমার নেইই। আমি নিজেই তো একেবারে "মূর্তিমতী গদ্য"। আমি কবি হলে কি আর শ্রীপ্রীতিকুমারের এত

পার্ষদ থাকতো? আমি দিবারাত্র তাঁর কানে কানে কবিতা আউড়ে তন্ময় করে রাখতাম। সে আর ভাগ্যে হল কই? শ্রীপ্রীতিকুমারেরও দুর্ভাগ্য নীহারদির কবি প্রতিভার সম্মুখীন হতে পারলেন না। তবে নীহারদির তার জন্য কোনও পরোয়া নেই। তাঁকে শুশ্রূষা করবার জন্য যত আয়া আসছে তত পূর্ণোদ্যমে তিনি কবিতা লিখে যাচ্ছেন। মাঝে মাঝে আমাকে দু চারটে শুনিয়ে ফেলছেন। আজকাল আমি "লাবনীর" রাস্তা প্রায় ত্যাগ করেছি।

আমাকে মাঝে মাঝে চিঠি দিয়ে উৎসাহিত করেন মিসেস স্মিতা চৌধুরী। আমার লেখা নাকি তাঁর খুব ভাল লাগে। চিঠি দেন পুরুলিয়া যোগদা সৎসঙ্গের গার্লস স্কুলের বড়দি শ্রীমতী চামেলী সেনগুপ্তা। আসল কথা যাদের নিজের কর্ম সম্বন্ধে আস্থা নেই, তাদের আমার লেখা সম্বন্ধে ক্ষোভ আছে। কিন্তু যে শ্রীপ্রীতিকুমারকে নিংড়ে রস করে বোতলে ভরে নিতে চায়নি, সে ক্ষোভ প্রকাশ করবে কেন? আমি তো কারও নামোল্লেখ করিনা। মোটামুটি আমি সেই সেই ব্যক্তিকে চিনি - আর তাঁরা পার্থসারথি পড়ে নিজেদেরকে মিলিয়ে নেন। মাঝে মাঝে Guilty Conscience তাঁদের নিজেকে চিনতে ভুল করে। অন্যকে নিয়ে লেখাও নিজের বলে মনে করে নেন। তাদের ক্ষোভ টের পাই সেই ব্যক্তির সাথে দীর্ঘদিন পরে দেখা হলে।

একটা খবর দিতে পারি। পার্থসারথির গ্রাহক সংখ্যা বেড়েছে। সারা বছর ধরে চাঁদা জমা হয় না। গ্রাহকরা নিজেরাই আগে আগে দিয়ে দেন। এটা আমাদের একটা চরম লাভ। শ্রীপ্রীতিকুমারকে দেখেছি এর জন্য কত অপেক্ষা করতেন।

সম্পাদক আমার পুত্তর হলেও দায়টা আমার। গ্রাহক করা, বই পাঠানো, কে আজ গ্রাহক নেই, কে কাল গ্রাহক হবে, কে বই পায় নি, কে দুটি বই পাবে ইত্যাদি, ইত্যাদি। মোট কথা এখন বেশ রপ্ত করে ফেলেছি ব্যাপারটা এবং পত্রিকাটিকে বেশ ভালবেসে ফেলেছি। বইটি ছাপা হতে দেরি হলে সেই শ্রীপ্রীতিকুমারের মতোই বকর বকর করি - দেরি হয়ে যাচ্ছে; বিশ্ব-পৃথিবীতে অনাসৃষ্টি হয়ে যাচ্ছে মনে করে। আসলে পৃথিবীটা গোল - তাই ঘটনাগুলিও ঘুরে

DO NOT COPY

ঘুরে আসে। ------

সব শেষে আমি আদিত্যদা ও মঞ্জুলাদিকে কৃতজ্ঞতা জানাই, যাঁদের কাছ থেকে সাহস না পেলে আমার পক্ষে মাথা ঠাণ্ডা করে কোনও কাজেই মন বসানো সম্ভব হত না। সবচেয়ে মজা হল বিপদে আপদে এমন সহায়তা পাওয়া সব মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়।

দ্বিতীয়তঃ অত্যন্ত স্বাচ্ছন্দ্যে আরামে তাঁদের সঙ্গে আমার শ্রীঅমরনাথ দর্শনের কাজটি হয়ে গেছে। অবশ্য সেখানে প্রধানতঃ আমি শ্রীপ্রীতিকুমারের উপস্থিতিটাই অনুভব করেছি।

আমার পক্ষে সকলের নাম করা সম্ভব হল না, তবু পার্থসারথি পত্রিকা প্রকাশের ব্যাপারে যাঁরা আমাকে সামান্যতম উপায়েও সাহায্য করেছেন তাদের সকলের প্রতি আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

– – – – – – – – – – – – –

(** রচনাকাল - জুন, ১৯৯০)

ভক্ত বৎসল শ্রী রামকৃষ্ণ **শ্রী প্রণব ঘোষ**

মণীন্দ্র কৃষ্ণ গুপ্ত

মণীন্দ্র কৃষ্ণ প্রথম ঠাকুর রামকৃষ্ণকে দর্শন করেন এগারো বছর বয়সে। ঐ অল্প বয়সেও তিনি ঠাকুরের প্রেমময় রূপ দেখে বেশ আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তারপর তিন বছর পরে পুনরায় ঠাকুরকে দর্শন করেন। তখন ঠাকুর চিকিৎসার জন্যে শ্যামপুকুরের ভাড়া বাড়িতে ছিলেন।

মণীন্দ্রকে দেখেই ঠাকুর বিছানা ছেড়ে উঠে পড়েন এবং তাঁকে কাছে ডেকে কানে কানে বলে দেন, "কাল একলা এসো, ওর সঙ্গে এসোনি।" মণীন্দ্রের সঙ্গে সেদিন সারদাবাবু এসেছিলেন। ঠাকুরের এই স্নেহস্পর্শে মণীন্দ্রের মনে ঠাকুরের

DO NOT COPY

প্রতি তীব্র আকর্ষণ হয়। ঠাকুরের নির্দেশ মত তিনি আবার ঠাকুরের কাছে এসে উপস্থিত হন। ঠাকুর চিরপরিচিতের মতো জিজ্ঞাসা করেন, "এতদিন কোথায় ছিলি?" তারপর সস্নেহে তাঁকে কোলে তুলে নিয়ে সমাধিস্থ হয়ে পড়েন। সমাধি ভঙ্গ হতে কিছু সময় লাগে। ইতিমধ্যে মণীন্দ্রের দেহমন জুড়ে ভাবাবেশ শুরু হয়ে যায়। তিনি অনুভব করেন কি এক শক্তি নীচে থেকে উপরের দিকে উঠছে, যেন সমস্ত জগৎ কোথায় লীন হয়ে যাচ্ছে আর সেই শূন্য মধ্যে তাঁর প্রাণ যেন কিসের সন্ধানে কেঁদে কেঁদে ফিরছে। মণীন্দ্রের দুচোখ দিয়ে অবিরল অশ্রু নির্গত হতে লাগল। ঠাকুরের নির্দেশে তাঁকে তখন অন্য ঘরে নিয়ে যাওয়া হল।

এরপর শ্যামপুকুরের বাড়িতে মণীন্দ্রের আনাগোনার বিরাম ছিল না। শেষ পর্যন্ত ঠাকুরের সেবার জন্য মণীন্দ্র বাড়ি ছেড়ে শ্যামপুকুরেই থাকতে শুরু করেন। বালকের পক্ষে রাত জাগা ভাল নয় মনে করে তাঁকে কেবল দিনের বেলায় সেবার সুযোগ দেওয়া হত। রাতে তিনি রামচন্দ্র দত্ত মশাইয়ের বাড়িতে থাকতেন। মণীন্দ্রের বয়স অল্প। তাই সকলে তাঁকে 'খোকা' বলে ডাকতেন।

ঠাকুর শ্যামপুকুর ছেড়ে কাশীপুরে গেলে মণীন্দ্র সেখানেও আগের মতো ঠাকুরের সেবা করতেন। সেবার সুযোগে তিনি ঠাকুরকে আরো কাছে পেয়েছিলেন। মণীন্দ্র কি নিষ্ঠা নিয়ে ঠাকুরের সেবা করতেন এবং ঠাকুরই বা তাঁকে কি চোখে দেখতেন মায়ের কথা থেকে তার আভাস পাওয়া যায় –

"শ্রীশ্রীঠাকুরের পীড়ার সময় খোকা (মণীন্দ্র) ও পতু তাঁকে হাওয়া করছিল। সেদিন দোলে সবাই আবির নিয়ে খেলা করছে। ঠাকুর তাঁদের বারংবার যেতে বলছেন, কিন্তু ঠাকুরের সেবা ফেলে তারা গেল না। ঠাকুর কাঁদতে কাঁদতে বললেন, 'আরে, এরাই আমার রামলালা।'

মণীন্দ্র কৃষ্ণ ঠাকুরকে গুরু ও ইষ্টরূপেই জানতেন। তবে তাঁর দীক্ষা সম্বন্ধে কুমুদবন্ধু সেন লিখেছেন-আমি তাঁকে দীক্ষার কথা জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিয়াছিলেন, 'একদিন ঠাকুরের কাছে বসে আছি, এমন সময় মহিম চক্রবর্তী এসে তাঁকে বললেন, গতকাল রাত্রে আমি স্বপ্নে দেখেছি আমি যেন একে (মণীন্দ্রকে)

মন্ত্র দিচ্ছি আপনার আদেশে। ঠাকুর বললেন, কি মন্ত্র পেয়েছ আমায় শোনাও। মহিম চক্রবর্তী উক্ত মন্ত্র উচ্চারণ করা মাত্রই ঠাকুর একেবারে সমাধিতে মগ্ন হলেন। পরে প্রকৃতিস্থ হয়ে ঐ মন্ত্র দিতে বললেন।'

কালীপদ ঘোষ

গিরিশচন্দ্র ঘোষের অকৃত্রিম বন্ধু কালীপদ ঘোষ স্বভাব চরিত্রে গিরিশেরই অনুরূপ ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তদের কেউ কেউ এই দুই বন্ধুকে জগাই মাধাই আখ্যা দিয়েছিলেন। এই নামকরণে সম্ভবত তেমন কোন ভুল ছিল না। জগাই মাধাইয়ের মতো গিরিশ কালীপদ দত্ত উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করতেন। চৈতন্যদেব জগাই মাধাইকে উদ্ধার করেছিলেন আর হালের জগাই মাধাই গিরিশ কালীপদকে উদ্ধার করেছিলেন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ।

কালীপদ ঠাকুরের সংস্পর্শে আসার অনেক আগে তাঁর স্ত্রী একদিন দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে স্বামীর উচ্ছৃঙ্খলতার কাহিনী ঠাকুরের শ্রীচরণে নিবেদন করে কৃপাভিক্ষা করেছিলেন। ঠাকুর তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বলেছিলেন কালীপদ সেখানকার লোক, তাঁর মতিগতির পরিবর্তন হবে এবং তিনি দক্ষিণেশ্বরে আসবেন। ঠাকুরের আশ্বাস ব্যর্থ হবার নয়। গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে কালীপদ একদিন দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে উপস্থিত হন এবং ঠাকুরের কৃপায় তাঁর স্বভাবের আমূল পরিবর্তনও ঘটে।

প্রথম দিনে দক্ষিণেশ্বরে এসে কালীপদ ঠাকুরকে প্রণাম না করেই আসন গ্রহণ করেছিলেন। তার কারণ তিনি ভক্তিভাব নিয়ে আসেননি, এসেছিলেন ঔৎসুক্য বশত। অল্পক্ষণ বাদে আবার কলকাতায় ফিরে গিয়েছিলেন। কিন্তু ঠাকুরের লীলা বুঝবে কে? বাড়ি ফিরেই তাঁর আবার দক্ষিণেশ্বরে আসার ইচ্ছা হয়। সুতরাং দু-একদিনের মধ্যে তিনি দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হন। ঠাকুর তাঁকে বলেন তিনি কলকাতায় যেতে চান। কালীপদর নৌকা ঘাটে বাঁধা ছিল। তিনি ঠাকুরকে নিয়ে নৌকায় ওঠেন। নৌকায় বসে কালীপদর সঙ্গে ঠাকুরের কথাবার্তা হয়। কালীপদ ঠাকুরকে জানান যে তিনি কালীমাতার ভক্ত, তবে তিনি গুরুতে বিশ্বাসী নন, তাই তাঁর দীক্ষাও হয়নি। ঠাকুর তখনই তাঁকে জিভ বার করতে বলেন। তিনি বিনা

প্রতিবাদে জিভ বার করলে ঠাকুর আঙ্গুলের নখাগ্র দিয়ে তাতে কিছু লিখে দেন। তারপর কালীপদর সঙ্গে তাঁর গৃহেই উপস্থিত হন। এইভাবে ঠাকুর অযাচিত ভাবে কৃপা করেছিলেন।

ঠাকুরের দিব্য স্পর্শে কালীপদর স্বভাবের দ্রুত পরিবর্তন হতে থাকে। শেষ পর্যন্ত কালীপদ সব আসক্তি জয় করতে সমর্থ হন। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই অক্টোবর ঠাকুর আনন্দ প্রকাশ করে বলেছিলেন, "কালীপদ বলেছে, সে একেবারে সব ছেড়েছে।"

কালীপদ অচিরেই ঠাকুরের অন্তরঙ্গ ভক্তমণ্ডলীতে স্থান লাভ করেন। ঠাকুরের জন্মোৎসব ও মহোৎসব হলে তিনি তাতে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করতেন। তাঁর কর্মকুশলতার জন্যে ঠাকুর তাঁকে 'ম্যানেজার' আখ্যা দিয়েছিলেন। শ্যামপুকুরে অবস্থান কালে ঠাকুর নিজে কালীপূজা করেছিলেন। পূজার প্রয়োজনীয় উপাচার সংগ্রহের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন কালীপদ। পূজার আসনে বসে ঠাকুর সমাধিস্থ হয়ে পড়েন এবং মা কালীর ভাবে আবিষ্ট বরাভয়কর ঠাকুরের পাদপদ্মে ভক্তরা পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন। এই দিন কালীপদ ঠাকুরের সেবার জন্যে বাড়ি থেকে সুজির পায়েস করে এনেছিলেন। ভক্তবৎসল ঠাকুর সেই পায়েস গ্রহণ করে ভক্তবাঞ্ছাপূর্ণ করেছিলেন।

কাশীপুরে ঠাকুর কালীপদকে বিশেষ কৃপা করেছিলেন (১১ই ডিসেম্বর, ১৮৮৫)। কালীপদর বুক স্পর্শ করে ঠাকুর বলেছিলেন, 'চৈতন্য হোক!' আর চিবুক ধরে আদর করেছিলেন।

ঠাকুরের লীলাবসানের পর কালীপদ ঠাকুরের ধ্যানে ও প্রসঙ্গে সময় অতিবাহিত করতেন। কালীপদ নিজ কর্মস্থলেও বিশেষ প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন। তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন তাঁর চরিত্রের পরিবর্তন ও কর্মে সাফল্যের মূলে ছিল ঠাকুরের আশীর্বাদ।

DO NOT COPY

উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় আহিরীটোলায় বাস করতেন। আহিরীটোলায় অধরলাল সেন, দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার প্রভৃতি ঠাকুরের অন্যান্য ভক্তরাও বাস করতেন। সম্ভবত কোন এক ভক্তের বাড়িতে উপেন্দ্রনাথ প্রথম ঠাকুরকে দর্শন করেন। তারপর দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত শুরু করেন।

উপেন্দ্রনাথ মামার বাড়ি থাকতেন। মামার বাড়িতে নারায়ণের নিত্য পূজা ছিল। সে কথা জানতে পেরে ঠাকুর তাঁকে একদিন নারায়ণের প্রসাদ আনতে বলেছিলেন। উপেন্দ্রনাথ নারায়ণের প্রসাদ নিয়ে দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হলে ঠাকুর আনন্দ করে তা নিলেন এবং নরেন্দ্র, রাখাল প্রভৃতি ভক্তদের দিলেন।

উপেন্দ্রনাথের আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল না। অন্যান্য ভক্তদের মতো তিনি ঠাকুরের সেবা করতে পারেন না বলে তাঁর মনে দুঃখ ছিল। অন্তর্যামী ঠাকুর সে কথা জানতে পেরে তাঁকে দু পয়সার জিলিপি আনতে বলেছিলেন। পরে উপেন্দ্রনাথের ভাগ্যের পরিবর্তন হয়, তখনও তিনি ঠাকুরের কৃপার কথা স্মরণ করে জিলিপি ভোগের ব্যবস্থা করতেন।

দরিদ্র বলে উপেন্দ্রনাথের মনে সুখ ছিল না। তাঁর অক্ষমতার জন্যে বাড়িতে গঞ্জনাও ভোগ করতে হত। তাঁর অবস্থা বুঝে ঠাকুর একদিন তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "তুই কি চাস?" তিনি স্পষ্ট উত্তর দিলেন, "অর্থ চাই।" ভক্তবাঞ্ছা কল্পতরু ঠাকুর আশীর্বাদ করে বললেন, "খুব হবে।" ঠাকুরের আশীর্বাদ সফল হয়েছিল। পুস্তক ব্যবসায়ে উপেন্দ্রনাথ বিপুল অর্থ উপার্জন করেছিলেন।

ঠাকুরের কাছে অর্থ চাইলেও উপেন্দ্রনাথ অর্থকেই জীবনের ধ্যানজ্ঞান করেননি। ঠাকুরের উৎসব এবং ভক্ত সেবায় অর্থ ব্যয় করে তিনি অর্থের সদ্ব্যবহার করতেন। তিনি বিশ্বাস করতেন তাঁর সৌভাগ্যের মূলে ছিল ঠাকুরের অব্যর্থ আশীর্বাদ।

চুনীলাল বসু

চুনীলাল বসু জনৈক সহকর্মীর কাছে ঠাকুরের সন্ধান পেয়ে ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের

DO NOT COPY

মার্চ মাসে প্রথম দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হন। ঠাকুর পরম আত্মীয়ের মতো কথাবার্তা বলেন এবং বিদায় কালে মিছরি প্রসাদ খেতে দেন।

দ্বিতীয়বার দক্ষিণেশ্বরে গেলে চুনীবাবু বলরামবাবুকে দেখতে পান। বলরামবাবু তাঁর প্রতিবেশী হলেও দুজনের মধ্যে আলাপ পরিচয় ছিল না। ঠাকুর চুনীবাবুকে বলরামবাবুর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, "ইনি তোমার পাশেই থাকেন; তুমি যখন আসবে, এঁকে নিয়ে এসো।" এই পরিচয় শেষে ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হয়।

ঠাকুরের সংস্পর্শে আসার আগে চুনীবাবু মাছ মাংস ছেড়ে সাত্ত্বিকভাবে জীবন যাপন করতেন এবং গোপনে প্রাণায়ামাদি অভ্যাস করতেন। এর ফলে তাঁর হাঁপানি রোগ হয়। এই রোগবশতঃ তিনি কিছুদিন দক্ষিণেশ্বরেও যেতে পারেননি। সুস্থ হয়ে যেদিন তিনি প্রথম দক্ষিণেশ্বরে যান সেদিন ঠাকুর তাঁকে দেখামাত্র বলে ওঠেন, "তোমাদের ওসব কেন? তোমরা গৃহী মানুষ, ওসব যোগ টোগ তোমাদের জন্যে নয়! ঈশ্বরে ভক্তি বিশ্বাস থাকলেই হল। এখান থেকে ফেরার সময় গোপাল ব্রহ্মচারীর কাছ থেকে তিন মাত্রা ওষুধ নিয়ে যেও। ওসব কাজ আর করো না।" চুনীবাবু ঠাকুরের মুখে এই কথা শুনে অবাক হয়ে গেলেন কেননা তাঁর যোগাভ্যাসের কথা কেউ জানত না। তিনি আরও বিস্মিত হলেন যখন দেখলেন ঐ তিন মাত্রা ওষুধেই তাঁর রোগ সম্পূর্ণ সেরে গেল। এরপর তিনি ঠাকুরকে অবতার জ্ঞানে ভক্তি করতেন।

চুনীবাবুর অবস্থা ভালো ছিল না। অন্যদের মতো ঠাকুরের সেবার জন্যে তিনি অর্থ ব্যয় করতে পারতেন না বলে তাঁর মনে দুঃখ ছিল। অন্তর্যামী ঠাকুর সে কথা জেনে জল খাওয়ার জন্যে একটা কাঁচের গ্লাস কিনে আনতে বলেছিলেন।

চুনীবাবু সম্পর্কে ঠাকুরের উচ্চ ধারণা ছিল। ঠাকুরের মুখের কথা থেকে তার আভাস পাওয়া যায়। একদিন ঠাকুর মাষ্টার মশাইকে বলেছিলেন, "চুনীতে আর তোমাতে আনা-গোনায় উদ্দীপন হয়েছে।" – কথামৃত ৪/৩১/২

১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী ঠাকুর কল্পতরু হয়ে ভক্তদের মনোবাঞ্ছা পূরণ করেছিলেন। তখন চুনীবাবু সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। এই ঘটনা শেষে ঠাকুর যখন নিজের ঘরে ফিরে গিয়ে বিশ্রাম করছিলেন তখন চুনীবাবু উদ্যানবাটীতে উপস্থিত হন এবং নরেন্দ্রনাথের পরামর্শে উপরে গিয়ে ঠাকুরকে প্রণাম করেন। ঠাকুর তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, "তুমি কি চাও?" চুনীবাবু এই প্রশ্নের কোন উত্তর দিতে না পারায় ঠাকুর নিজের শরীর দেখিয়ে বলেছিলেন, "এটাতে ভক্তি বিশ্বাস রেখো। তোমার হবে।" ঠাকুরের এই নির্দেশ তিনি আমরণ মেনে শেষ মুহূর্তে শ্রীরামকৃষ্ণ নাম জপ করতে করতে দেহত্যাগ করেন।

গোপালের মা

গোপালের মা নামে যিনি শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তমন্ডলীতে পরিচিত তাঁর আসল নাম ছিল অঘোরমণি দেবী।

অঘোরমণি ঠাকুরের দর্শন পান দক্ষিণেশ্বরে ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের এক শুভদিনে। প্রথম দর্শনেই তিনি ঠাকুরের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং ঐ আকর্ষণে দু চার দিন বাদে আবার উপস্থিত হন। তাঁকে দেখে ঠাকুর বলে ওঠেন, "এসেছ ? আমার জন্যে কি এনেছ দাও।" অঘোরমণি আসবার সময় দু তিন পয়সার সন্দেশ কিনে এনেছিলেন, সে সন্দেশ ভালো ছিল না। সঙ্কোচের সঙ্গে সেই সন্দেশ বার করলে ঠাকুর সেগুলি মহানন্দে খেতে খেতে বললেন, "তুমি পয়সা খরচ করে সন্দেশ আন কেন ? নারকেল নাড়ু করে রাখবে, তাই দুটো একটা আসবার সময় আনবে। না হয় যা তুমি নিজের হাতে রাঁধবে, লাউশাক-চচ্চরি, আলু বেগুন বড়ি দিয়ে সজনে খাড়ার তরকারি তাই নিয়ে আসবে। তোমার হাতের রান্না খেতে বড় সাধ হয়।" ব্রাহ্মণী ভাবলেন, "ভাল সাধু দেখতে এসেছি - কেবল খাই খাই। আমি গরীব কাঙাল লোক, কোথায় এত খাওয়াতে পাবো ? দূর হোক আর আসব না।" কিন্তু না এসে পারলেন না। কয়েকদিন বাদে চচ্চড়ি রান্না করে নিয়ে এলেন আর ঠাকুর তা খেয়ে শতমুখে রান্নার প্রশংসা করে বলতে লাগলেন, "আহা কি রান্না! যেন সুধা, সুধা!" নিজের হাতে রান্না করা সামান্য চচ্চড়ির এত প্রশংসা শুনে আনন্দে

ব্রাহ্মণীর চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল - ভাবলেন তিনি গরীব কাঙ্গাল, তাঁর এই সামান্য জিনিসের ঠাকুর অত বড়াই করছেন।

ব্রাহ্মণী রাত তিনটের সময় জপে বসতেন। একদিন রাত্রে জপ সেরে প্রাণায়াম করবেন এমন সময় দেখলেন ঠাকুর তাঁর বাঁ দিকে বসে মৃদু মৃদু হাসছেন। ঐ সময় কোথা থেকে ঠাকুর ওখানে এলেন - এ কথা ভাবতে ভাবতে যেই তিনি ঠাকুরের হাতটা ধরেছেন অমনি ঠাকুরের মূর্তি অদৃশ্য হয়ে গেল এবং তার পরিবর্তে সেখানে উপস্থিত হল সত্যকার গোপাল, দশ মাসের শিশু। সে 'মা, ননী দাও' বলে ব্রাহ্মণীর কাছে আবদার করতে লাগল। ব্রাহ্মণী তো অবাক। তিনি গোপালের কাছে কেঁদে কেঁদে বলতে লাগলেন, "বাবা, আমি দুঃখিনী কাঙ্গালিনী, আমি তোমায় কি খাওয়াব, ননী ক্ষীর কোথায় পাব, বাবা?" গোপাল কিন্তু কিছুতেই নিরস্ত হয় না, সমানেই বায়না করতে থাকে। শেষে ব্রাহ্মণী নাড়ু খেতে দিয়ে শান্ত করেন।

সকাল হতে না হতে গোপালের মা গোপালকে কোলে করে দক্ষিণেশ্বরে রওনা হলেন। আলুথালু বেশে উদ্‌ভ্রান্তের মতো ঠাকুরের ঘরে প্রবেশ করে তিনি ঠাকুরের পাশে গিয়ে বসলেন। ঠাকুরও তখন ভাবাবেশে আচ্ছন্ন হয়ে তাঁর কোলে গিয়ে বসলেন। গোপালের মাও ঠাকুরকে গোপাল জ্ঞানে সঙ্গে আনা ক্ষীর, সর খাওয়াতে লাগলেন। বাষট্টি বছর বয়স্ক বৃদ্ধার মাতৃস্নেহ এবং প্রৌঢ় শ্রীরামকৃষ্ণের গোপাল ভাব দেখে সকলে তখন মুগ্ধ, বিস্মিত। বাল গোপাল কিন্তু তখনও আছেন এবং নানাভাবে লীলা করছেন। গোপালের মা ভাবাবেশে বলতে লাগলেন, "এই যে গোপাল আমার কোলে, ঐ যে তোমার ভিতর ঢুকে গেলো, ঐ আবার বেরিয়ে এলো, আয় বাবা, দুঃখিনী মায়ের কাছে আয়।" গোপালের মার আনন্দ দেখে ঠাকুর অপর আর একজন মহিলাকে বলেছিলেন, "দেখ, দেখ। আনন্দে ভরে গেছে - ওর মনটা এখন গোপাল-লোকে চলে গেছে।" ঠাকুর অঘোরমণিকে এই দিন থেকে 'গোপালের মা' নামে সম্বোধন করতে লাগলেন। গোপালের মার ভাব প্রশমনের জন্য ঠাকুর তাঁর বুকে হাত বুলিয়ে দিলেন, ভাল ভাল খাবার এনে খাওয়ালেন এবং সারাদিন কাছে রেখে স্নানাহার করালেন। খেতে খেতে ব্রাহ্মণী বলতে লাগলেন,

DO NOT COPY

“বাবা গোপাল, তোমার দুঃখিনী মা এ জন্মে বড় কষ্টে কাল কাটিয়েছে, টাকু ঘুরিয়ে, সুতো কেটে পৈতা করে বেচে দিন কাটিয়েছে - তাই বুঝি এত যত্ন আজ করছ?”

গোপালকে নিয়ে ব্রাহ্মণীর বাৎসল্য ভাবের লীলা আরো অনেকদিন চলেছিল। শেষে গোপালের অবিরাম দর্শন বন্ধ হয়ে যায়। তখন ব্রাহ্মণী ভীত হয়ে ঠাকুরকে বলেছিলেন, “গোপাল, তুমি আমার কি করলে ? আমার কি অপরাধ হল? কেন আর আমি তোমায় আগেকার মত (গোপাল রূপে) দেখতে পাই না?” ঠাকুর তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বলেছিলেন, “ওরূপ সদা সর্বক্ষণ দর্শন হলে কলিতে শরীর থাকেনা। একুশদিন মাত্র শরীরটা থেকে তারপর শুকনো পাতার মত ঝরে পড়ে যায়।”

ঠাকুর গোপালের মাকে মায়ের মতই দেখতেন। একদিন তাঁর মাথা থেকে পা পর্যন্ত সর্বাঙ্গে হাত বুলিয়ে ঠাকুর বলেছিলেন, “এ খোলটার ভেতর কেবল হরিতে ভরা - হরিময় শরীর!” তারপর ভাল ভাল জিনিস এনে খাওয়াতে লাগলেন। শুধু ঐদিন নয়, গোপালের মা দক্ষিণেশ্বরে গেলেই ঠাকুর তাঁকে মনের আনন্দে খাওয়াতেন। একদিন গোপালের মা প্রশ্ন করলেন, “গোপাল, তুমি আমায় অত খাওয়াতে ভালবাস কেন?” ঠাকুর উত্তর দিলেন, “তুমি যে আমায় আগে কত খাইয়েছ।” গোপালের মা জিজ্ঞাসা করলেন, “আগে কবে খাইয়েছি?” ঠাকুর বললেন, “জন্মান্তরে।”

একদিন গোপালের মা দক্ষিণেশ্বরে এসে ঠাকুরের সঙ্গে আলাপ করে নহবতে গিয়ে জপে বসেন। জপ সেরে প্রণাম করে উঠবেন, এমন সময় ঠাকুর পঞ্চবটীর দিক থেকে এসে তাঁকে বললেন, “তুমি এখনও এত জপ কর কেন? তোমার তো খুব হয়েছে!” ব্রাহ্মণী বললেন, “জপ করব না? আমার কি সব হয়েছে?” ঠাকুর বললেন যে তাঁর সব হয়েছে। তথাপি তাঁর যেন বিশ্বাস হতে চায় না। শেষে তিনি জপ করতেন, তবে সে শুধু ঠাকুরের শরীরটা ভাল থাকবে - এই উদ্দেশ্যে।

ঠাকুর একবার তাঁর মানসপুত্র রাখালকে নিয়ে কামারহাটীতে ব্রাহ্মণীর গৃহে

গিয়েছিলেন। ব্রাহ্মণী আনন্দে আত্মহারা হয়ে ঠাকুরের সেবা করেছিলেন।

একবার রথের সময় ঠাকুর বলরাম বাবুর বাড়ি গিয়ে গোপালের মার কথা স্মরণ করেন এবং লোক পাঠিয়ে তাঁকে ওখানে আনাবার পরামর্শ দেন। বলরাম বাবু সঙ্গে সঙ্গে লোক পাঠিয়ে দেন। সন্ধ্যাবেলা ঠাকুর ভক্তদের সঙ্গে বসে আলাপ করছেন, এমন সময় দেখা গেল ঠাকুর বালগোপাল মূর্তির মত হামা দেওয়ার ভঙ্গিতে এক হাত তুলে কারো কাছে কি যেন চাইছেন। ঠিক সেই মুহূর্তে গোপালের মা উপরে এসে ঠাকুরকে ইষ্টরূপে দর্শন করে আশ্চর্য হন। উপস্থিত সকলে গোপালের মাকে সাদর অভ্যর্থনা করে বলতে লাগলেন যে তাঁর ভক্তির প্রভাবেই ঠাকুর গোপালরূপ ধারণ করেছিলেন।

যোগীন মা

যোগীন্দ্র মোহিনী বিশ্বাস একদিকে যেমন ঠাকুরের ভক্ত, অন্যদিকে শ্রীশ্রীমার সহচরী ছিলেন। বলরাম বাবুদের সঙ্গে ওঁদের আত্মীয়তা ছিল এবং সেই সূত্রেই বলরাম ভবনে ঠাকুরের শুভাগমন উপলক্ষ্যে নিমন্ত্রণ পেয়ে সেখানে যান এবং দর্শন লাভ করেন।

প্রথম দর্শনে যোগীন-মা ঠাকুরের স্বরূপ সঠিক উপলব্ধি করতে পারেন নি। পরে দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত করতে করতে তিনি ঠাকুরের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করতে পারেন। ঠাকুরকে তিনি কি চক্ষে দেখতেন একটা কথায় তা বেশ বোঝা যায়। ঠাকুর একবার গোলাপ-মার বাড়ি হয়ে যোগীন-মার বাড়িতে উপস্থিত হন। ঠাকুর একতলার বৈঠকখানায় ভক্তদের সঙ্গে বসে গান জলখাবারের জন্য ঠাকুরকে ভিতরে যাবার অনুরোধ করলে ঠাকুর সেখানেই আনতে আদেশ করেন। তখন গোলাপ-মা বলেন, “গণুর মা (যোগীন-মা) বলেছে ঘরটায় একবার পায়ের ধূলা দিন, তা হলে ঘর কাশী হয়ে থাকবে - ঘরে মরে গেলে আর কোন গোল থাকবে না।”

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে ঠাকুর রথযাত্রা উপলক্ষ্যে বলরাম ভবনে গিয়েছিলেন। রথের পর দক্ষিণেশ্বরে ফেরার সময় যোগীন-মা তাঁকে প্রণাম করতেই ঠাকুর তাঁর দিকে

চেয়ে বললেন, "চ'না গো, মা, চ'না !" ঠাকুরের এই সাদর আহ্বানে এমন এক দুর্নিবার আকর্ষণ ছিল যে, যোগীন-মা সময়-অসময়, সুবিধা-অসুবিধা কোন কিছু চিন্তা না করে একজন সঙ্গীসহ ঠাকুরের নৌকায় গিয়ে ওঠেন। দক্ষিণেশ্বরে পোঁছেও ঠাকুর পরম আত্মীয়ের মতো তাঁদের সঙ্গে ব্যবহার করেন। লোকাভাবে তাঁরাই বাজারে গিয়ে আলু, বেগুন ও শাক কিনে আনলেন। নহবতে স্বয়ং সারদা মা রান্না করলেন। খেয়েদেয়ে সারাদিন ঠাকুরের কথামৃত পান করে সন্ধ্যায় আবার তাঁরা বাড়ি ফিরে গেলেন।

শুধু ঠাকুর নয়, মায়ের টানেও যোগীন-মা দক্ষিণেশ্বরে যেতেন। মা তাঁর সঙ্গে সখীর মত ব্যবহার করতেন, সব বিষয়ে আলোচনা করতেন এবং রাত্রে কাছে নিয়ে শুতেন। যোগীন-মার চুল বাঁধা মার খুব পছন্দ হত। যোগীন-মা একবার চুল বেঁধে দিলে মা তিন-চারদিন খুলতেন না। স্নানের সময়েও খুলতেন না। বলতেন, "ও যোগীনের বাঁধা চুল, সে আবার আসলে সেই দিন খুলবো।" প্রথম পরিচয়ের কিছুদিন পরে মা নৌকা করে জয়রামবাটী গিয়েছিলেন। গঙ্গার ঘাট থেকে যতক্ষণ নৌকাখানা দেখা যায় ততক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে শেষে নহবতে বসে বসে যোগীন-মা অনেকক্ষণ কেঁদেছিলেন। তা দেখতে পেয়ে ঠাকুর তাঁকে সান্ত্বনা দেবার জন্য নিজের সাধক জীবনের অনেক কথা তাঁকে বলেছিলেন। দেড় বছর পর মা জয়রামবাটী থেকে ফিরলে ঠাকুর মাকে বলেছিলেন, "সেই যে ডাগর ডাগর চোখ মেয়েটি আসে, সে তোমাকে খুব ভালবাসে। তুমি যাবার দিন নহবতে বসে খুব কাঁদছিল।"

ঠাকুর ও মার অন্তরঙ্গ সান্নিধ্য লাভ করবার পর যোগীন-মা জীবনে নতুন আনন্দের স্বাদ পেয়েছিলেন। আত্মীয়স্বজন সবাইকে ঠাকুরের চরণাশ্রয়ে টেনে এনেছিলেন। তাঁর উচ্ছৃঙ্খল স্বামী অম্বিকাচরণও দক্ষিণেশ্বরের দাক্ষিণ্যে সৎ পথে সংযত জীবন যাপনের চেষ্টা করেছিলেন, তবে তিনি পাগলা কুকুরের কামড়ে অকালেই মৃত্যুমুখে পতিত হন।

ঠাকুর যোগীন-মাকে নিজের দেহ দেখিয়ে বলেছিলেন, "দ্যাখো, তোমার যে

ইষ্ট তা এর ভেতরেই আছে, একে ভাবলেই তাঁকে মনে পড়বে।" যোগীন-মার নিজের উপলব্ধির সঙ্গেও এই কথাটা মিলেছিল। তিনি ধ্যান করতে বসলেই ঠাকুর এসে সামনে দাঁড়াতেন। যোগীন-মা খুবই তপস্যাপ্রবণ ছিলেন। পাছে বেশী কঠোরতার ফলে তাঁর শরীর ভেঙ্গে পড়ে এই ভয়ে ঠাকুর তাঁকে বলেছিলেন, "তোমাদের আর কি বাকী গো? (নিজের দেহ দেখিয়ে) তোমরা দেখলে, খাওয়ালে, সেবা করলে।" ঠাকুর যোগীন-মাকে আরো বলেছিলেন, "ব্যাকুল হয়ো না গো! মরণকালে তোমার সহস্র দল পদ্ম বিকশিত হয়ে তোমায় পরম জ্ঞান দান করবে।" ঠাকুরের সেই ভবিষ্যৎ বাণী সফল হয়েছিল। শেষদিন যতই ঘনিয়ে আসতে লাগল তিনি ভগবান ছাড়া আর সব কিছুই ভুলে থাকলেন। মৃত্যুর আগে কয়েকদিন ঈশ্বরাবেশে তিনি সর্বদা আচ্ছন্নের মত পড়ে থাকতেন।

জ্ঞানতাপস্বী অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ **শ্রীদীপঙ্কর নন্দী**

বাংলাদেশে সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে বহুভাষাবিদ্ পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ একটি অবিস্মরণীয় নাম। ভারত সংস্কৃতির উৎসধারার সন্ধানে যে সকল মনীষী নিরলস ও নিরবচ্ছিন্ন ভাবে নিজেদের জীবন ব্যয় করে গিয়েছেন তাদের মধ্যে পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের নাম উল্লেখ্য। বাংলাদেশে ভারত-বিদ্যা ও সংস্কৃতির রত্ন ভান্ডারের ঐশ্বর্য সমৃদ্ধি সাধনে ও বিবর্দ্ধনে যে সকল মনীষী প্রতিভাদীপ্ত স্বাক্ষর রেখে গিয়েছেন নানা শাস্ত্র ও জ্ঞানের আধার পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ তাঁদের পুরোভাগে। তাঁর দুর্লভ তথ্য ও তত্ত্ব-সমৃদ্ধ বিপুল সংখ্যক ভারতবিদ্যা ও সংস্কৃতি বিষয়ক প্রবন্ধাবলী, তাঁর রচিত এবং সম্পাদিত গ্রন্থাবলী - সর্বোপরি তাঁর সম্পাদিত ও পরিকল্পিত অমূল্য জ্ঞানের আকর কোষগ্রন্থ 'বঙ্গীয় মহাকোষ' বিশ্ববিদ্যায় তাঁর অসীম জ্ঞান ও গরিমা এবং অতুলনীয় পাণ্ডিত্য ও মনীষার জ্বলন্ত নিদর্শন। তাঁর অগাধ বিদ্যার খ্যাতি সেযুগে এতদূর প্রসার লাভ করেছিল যে তাঁর পারিবারিক

DO NOT COPY

উপাধি, তাঁর বিদ্যার গৌরবব্যঞ্জক 'বিদ্যাভূষণ' উপাধির আড়ালে ঢাকা পড়ে যায়। বিশ্ববিদ্যায় তাঁর প্রগাঢ় প্রজ্ঞা ও সীমাহীন পাণ্ডিত্যের জন্যই তিনি সে যুগে 'চলমান অভিধান', 'জীবন্ত বিশ্বকোষ' প্রভৃতি নানা সম্মানজনক অভিধায় সম্মানিত ছিলেন।

অমূল্যচরণ ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই ডিসেম্বর কলকাতার একটি বিশিষ্ট বর্দ্ধিষ্ণু পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম উদয়চাঁদ ঘোষ, মায়ের নাম যাদুমণি দেবী। পৈত্রিক নিবাস ছিল চব্বিশ পরগণা জেলার নৈহাটী গ্রামে।

অমূল্যচরণ কিশোর বয়স থেকেই অত্যন্ত মেধাবী, অধ্যবসায়ী ও পাঠানুরাগী। অধ্যয়নে ছিল তাঁর ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও একাগ্রতা। যে পুস্তক পাঠে মনোনিবেশ করতেন, তাতেই তিনি একেবারে তদ্গতচিত্ত – তন্ময় হয়ে যেতেন। বাহ্য জ্ঞান থাকত না। এই সকল সৎগুণের ফলে তিনি অল্প আয়াসে যে কোন বিদ্যা আয়ত্ত করতে পারতেন।

তিনি কলকাতার কেশব একাডেমির ছাত্র ছিলেন। স্কুলের হেড পণ্ডিত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি প্রায়ই তাঁর বাড়ীতে আসতেন তাঁর দ্বারা ইংরেজী বা অন্য কোন ভাষা থেকে অনুবাদ করিয়ে নিতে। পাঠ্যাবস্থাতেই তিনি অনুবাদ কর্মে এবং প্রবন্ধ রচনায় বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করেন। এই সময়ে তিনি মন্মথ দত্তের সম্পাদিত 'কুইন' (Queen) পত্রিকায় ইংরাজী ভাষায় অনেকগুলি সারগর্ভ প্রবন্ধ রচনা করে প্রকাশ করেন।

অমূল্যচরণের ছিল অসীম জ্ঞানতৃষ্ণা। জ্ঞান আহরণের জন্য সদাই তাঁর জ্ঞান পিপাসু মন তৃষ্ণায় কাতর হত। পাঠ্যাবস্থায়ই তিনি চৈতন্য লাইব্রেরীর সমস্ত পুস্তক পাঠ করে ফেলেন। পরবর্তীকালে তিনি এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগার ও কলকাতার ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর (অধুনা জাতীয় গ্রন্থাগার) প্রায় সমুদয় গ্রন্থ পাঠ করেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ও মেট্রোপলিটন কলেজ (অধুনা বিদ্যাসাগর কলেজ) লাইব্রেরীর সমস্ত গ্রন্থ তো ছিল তাঁর নখদর্পনে।

ছেলেবেলা থেকেই অমূল্যচরণের বিভিন্ন ভাষা শিক্ষার উপর ঝোঁক ছিল । তাঁর ধারণা হয়, অনেক ভাষা শিখতে পারলে, সেই সব ভাষায় রচিত জ্ঞানভান্ডারের

DO NOT COPY

দ্বার তাঁর নিকট উন্মুক্ত হয়ে যাবে। তিনি জ্ঞান আহরণের অশেষ সুযোগ লাভ করবেন। এই ধারণার বশবর্তী হয়ে তিনি প্রথমেই কাশী নরেশের চতুষ্পাঠীতে সংস্কৃত ব্যাকরণ ও সাহিত্য অধ্যয়ন করে পরীক্ষা দেন, বিদ্যাভূষণ উপাধি লাভ করেন। এসেমব্লিজ-এর (আজকের স্কটিশ চার্চ কলেজ) বৃদ্ধ ভাষা শিক্ষকের নিকট গ্রীক ও লাতিন ভাষা শিক্ষা করেন। বাড়ীতে একজন মৌলভী শিক্ষক নিযুক্ত করে তিনি ঊর্দু, আরবী ও ফার্সী ভাষার পাঠ গ্রহণ করেন। এইভাবে নবম শ্রেণীতে পাঠ কালেই তিনি বারটি ভাষায় পারদর্শিতা লাভ করেন। এরপর তিনি একে একে অসমীয়া, ইটালীয়, উড়িয়া, জাপানী, জার্মান, তামিল, তেলেগু, কানাড়ী, পর্তুগীজ, পালি, প্রাকৃত, ফরাসী, রুশ, হিন্দী, ব্রজবুলি, হিব্রু প্রভৃতি দেশী বিদেশী মোট ছাব্বিশটি ভাষায় অধিকার অর্জন করেন। সে সময়ে একমাত্র হরিনাথ দে ছাড়া এতগুলি ভাষায় অধিকার অর্জন আর কারো দ্বারা সম্ভব হয়নি। বহুভাষাবিদ্ রূপে হরিনাথ দের পরই তাঁর স্থান। এ বড় কম সম্মানজনক কথা নয়। কেবলমাত্র ভাষা শিক্ষা করে, তাতে অধিকার অর্জন করেই তিনি নিশ্চিন্ত ছিলেন না; শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সেই সব ভাষার জ্ঞান ভাণ্ডারে নিহিত জ্ঞান ও বিদ্যা আহরণ করেন। সেই সব ভাষায় রচিত সংস্কৃতি বিষয়ক পুস্তকরাজি প্রকাশিত হওয়া মাত্র তিনি তা ক্রয় করতেন প্রতি মাসেই। ভারতবর্ষে এবং ভারতবর্ষের বাহিরে প্রকাশিত একাধিক মূল্যবান পুস্তক তিনি ক্রয় করতেন ডাকযোগে। এইভাবে তাঁর গৃহে এক বিরাট গ্রন্থাগারের সৃষ্টি হয়। তিনি দিনে আঠারো ঘণ্টা পুস্তক পাঠে ব্যয় করতেন। তাঁর এই অমুল্য গ্রন্থাগারের দৌলতে সে যুগের অনেক মনীষী উপকৃত হয়েছেন। অনেক জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য অর্জন করেছেন।

বিভিন্ন ভাষায় বুৎপত্তি থাকায় অমূল্যচরণ ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে 'ট্রানস্লেটিং ব্যুরো' স্থাপন করেন। উপযুক্ত দক্ষিণার বিনিময়ে বিভিন্ন বিদেশী ভাষায় পত্রাদি অনুবাদ করে দেওয়া এই প্রতিষ্ঠানের কাজ ছিল। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি 'এডওয়ার্ড ইনস্টিটিউশন' নামে ভাষা শিক্ষার একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। এটিই ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠান, এর আগে এইরূপ কোন প্রতিষ্ঠান ভারতে ছিল না। কিছুকাল

পরে ভাষা শিক্ষা ব্যতীত সাধারণ শিক্ষার জন্য বিদ্যালয়ের একটি সাধারণ বিভাগ খোলা হয়। ১৯০৯ থেকে ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি এর অধ্যক্ষপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং ট্রানস্লেটিং ব্যুরোর উপার্জনের বেশীর ভাগ অংশই বিদ্যালয়ের কাজে ব্যয় হয়।

অমূল্যচরণ অসাধারণ স্মৃতিশক্তির অধিকারী ছিলেন। তাঁর মত শ্রুতিধর সে যুগে অতি অল্পই ছিল। তিনি ইংরেজী, বাংলা, সংস্কৃত বা যে কোন ভাষায় অধীত পুস্তকের পাতার পর পাতা অবলীলায় মুখস্থ বলে যেতে পারতেন। পূর্বোক্ত যে কোন গ্রন্থাগারের কোন গ্রন্থের কোন পাতায় কোন তত্ত্ব বা কি তথ্য বিবৃত আছে তা তিনি বিন্দুমাত্র চিন্তা না করে মুখে মুখে বলে দিতে পারতেন।

বিভিন্ন ভাষায় অমূল্যচরণের অদ্ভুত ব্যুৎপত্তি দেখে নগেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয় মেট্রোপলিটন কলেজে পালি ও ফরাসী ভাষা পড়াবার জন্য অনুরোধ করেন। ১৯০৫ সালে বিদ্যাসাগর কলেজে অধ্যাপক নিযুক্ত হন। গ্রীক ও লাতিন ভাষায় অসীম জ্ঞান থাকবার দরুণ তিনি খ্রীষ্টীয় মিশনারি পরিচালিত ডোভটোন কলেজে কিছুকাল অধ্যাপনা করেন। এর কিছুদিন পর স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর আহ্বানে তিনি জাতীয় শিক্ষা পরিষদে উপাধ্যায় রূপে জার্মান, পালি, ফরাসী ও বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। শ্রীঅরবিন্দ বোমার মামলায় অভিযুক্ত হলে তার স্থলে তিনি হিন্দু ও শিখ যুগের ইতিহাস ও দর্শনের অধ্যাপনা করেন। হিন্দু ও শিখ আমলের ইতিহাসে তাঁর ছাত্র ছিলেন প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক বিনয় কুমার সরকার। তাঁর প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ও একনিষ্ঠ অধ্যাপনার গুণে সকলেই তাঁর প্রতি শ্রদ্ধান্বিত ছিলেন।

অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার সঙ্গে সঙ্গে অমূল্যচরণ লেখনী চালনা করতে থাকেন অবিচল নিষ্ঠার সঙ্গে নিরবচ্ছিন্নভাবে। অল্পকালের মধ্যেই সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, জাতি, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে দুর্লভ তথ্য ও অমূল্য তত্ত্ব সমৃদ্ধ অসংখ্য প্রবন্ধ রচনা করে তদানীন্তন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশ করতে থাকেন। তার প্রতিভাদীপ্ত দুর্লভ তথ্য সমৃদ্ধ সারগর্ভ যুক্তিনির্ভর সরস প্রবন্ধরাজির মাধ্যমে তৎকালীন বিদগ্ধ মণ্ডলীতে তাঁর যশ, খ্যাতি ও বিদ্যাবত্তার গৌরব অচিরে ছড়িয়ে

DO NOT COPY

পড়ে। নানা বিষয়ে তাঁর অসীমজ্ঞান ও গরিমা সেযুগে কিংবদন্তিতে পরিণত হয়। এবং তার অগাধ জ্ঞানভাণ্ডারের জ্ঞানরত্ন আহরণের জন্য কত জ্ঞানী, গুণী, ঐতিহাসিক, প্রত্নতাত্ত্বিক, গবেষক, অনুসন্ধিৎসু মনীষীর দল এসেছেন তাঁর কাছে বহু বিচিত্র জিজ্ঞাসা নিয়ে। এঁদের মধ্যে ঐতিহাসিক নিখিলনাথ রায়, ডাক্তার সুন্দরী মোহন দাস, সাহিত্যাচার্য দীনেশচন্দ্র সেন, বিশ্ববিশ্রুত ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, স্বামী অভেদানন্দ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রমুখ বিদ্বজনের নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি একরকম কোন পুস্তকের সাহায্য না নিয়েই মুখে মুখে তাদের মনের দ্বিধাদ্বন্দ্ব সংশয় ও নানা প্রশ্নের জবাব দিয়ে তাদের অজ্ঞানতার অন্ধকার দূর করতেন। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় তাকে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে লিখেছিলেন, "তোমার তো সব নখদর্পণে। এক লাইন লিখিয়া তোমার মতামত জানাইবে।"

কেবল পঠন, পাঠন ও লেখনী চালনাতেই (বিবিধ বিষয়ক গবেষণামূলক প্রবন্ধনিবন্ধ রচনা) তাঁর জ্ঞানচর্চা সীমাবদ্ধ ছিল না। তিনি বাংলা সাহিত্যের একজন একনিষ্ঠ অনুরাগী ছিলেন। তিনি অনেকগুলি মাসিক, সাপ্তাহিক পত্রিকা সম্পাদনা করে স্মরণীয় কীর্তি রেখে গিয়েছেন। ১৩১২ সালে তিনি 'বাণী' নামে একটি উচ্চাঙ্গের মাসিক পত্রিকা পরিচালনা ও সম্পাদনা করেন। বিখ্যাত 'ভারতবর্ষ' মাসিক পত্রিকাটি প্রথম তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। 'মর্ম্মবাণী' নামে সাপ্তাহিক পত্রিকাটির তিনিই ছিলেন অন্যতম সম্পাদক, তাঁর সহযোগী ছিলেন মহারাজা জগদীন্দ্রনাথ রায়। ১৩২১ সালে তিনি 'সংকল্প' নামে আর একখানি প্রথম শ্রেণীর মাসিক সম্পাদনা করেন। মাসিক "গৌরাঙ্গ সেবক" পত্রিকাটি দীর্ঘকাল তাঁর সুসম্পাদনায় সুখ্যাতি লাভ করে। তাঁর সম্পাদিত মাসিক পত্রিকাগুলির মধ্যে "পঞ্চপুষ্প" বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি দীর্ঘকাল মাসিক 'কায়স্থ' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। কলকাতার ইণ্ডিয়ান রিসার্চ ইন্সটিটিউট কর্তৃক প্রকাশিত সাহিত্য সংস্কৃতি মূলক মাসিক শ্রীভারতী নামে উচ্চাঙ্গের পত্রিকাটি তিনি দুই বৎসরকাল আমৃত্যু সম্পাদনা করেন। ভারতীয় শিল্পকলা বিষয়ক ত্রৈমাসিক 'ইণ্ডিয়ান একাডেমি অফ আর্ট' নামক সুবিখ্যাত ইংরেজী পত্রিকাটির তিনিই ছিলেন সুযোগ্য সম্পাদক। এই পত্রিকাগুলির মাধ্যমে এক একটি

তরুণ লেখক গোষ্ঠি তৈরী করেছিলেন। পরবর্তীকালে যাঁরা খ্যাতির শিখরে আরোহণ করেন তাঁদের মধ্যে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মোহিতলাল মজুমদার, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, হেমেন্দ্র কুমার রায়, প্রভাতকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র নন্দী প্রমুখের নামোল্লেখ করা যেতে পারে।

শেষজীবনে অমূল্যচরণ 'বঙ্গীয় মহাকোষ' সম্পাদনা ও পরিচালনা করে অক্ষয় কীর্তি রেখে গিয়েছেন। পরিকল্পনার বিশালতা, প্রাচীন ও আধুনিক তথ্যের সমাবেশ, বিশ্ববিদ্যা ও ভারতীয় ভাবধারার সমন্বয় সাধন এবং তথ্য আহরণে তাঁর ঐকান্তিক নিষ্ঠা বঙ্গীয় মহাকোষকে এক মহান বিশিষ্টতা দান করেছে। বিশ্ববিদ্যায় তাঁর অনন্য সাধারণ জ্ঞান ও গরিমা বিদ্যাবত্তা ও অতুলনীয় পাণ্ডিত্য তথা রসবোধ-সর্বোপরি তার সুসম্পাদনা ও পরিচালনার গুণে একটি শ্রেষ্ঠ ও উন্নততর মহাকোষ গ্রন্থ রূপে পরিগণিত হয়। কয়েক খণ্ড 'বঙ্গীয় মহাকোষ' পাঠ করে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছিলেন "এনসাইক্লোপিডিয়া করা বিদ্যাভূষণেরই কাজ; তাহার জ্ঞানে মহাকোষ সমৃদ্ধ হইলে বাংলা সাহিত্যের গৌরবের বস্তু হইবে।" আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় লিখিয়া ছিলেন, "ভারতবর্ষে ইহার পূর্বে এ রকম মহাকোষ কখনও বাহির হয় নাই। ইহার প্রধান সম্পাদক অধ্যাপক শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ ভারত বিখ্যাত পণ্ডিত। আমার বিশ্বাস এই মহাকোষ সকলেরই উপকারে লাগিবে। ইহা বাঙ্গালার গৌরব হউক।" সে যুগের সকল সুধী বিদগ্ধ মণ্ডলী ও পত্র পত্রিকা এক বাক্যে এর অকুণ্ঠ খ্যাতি ও প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়। বাংলাদেশ তথা ভারতে অদ্যাবধি প্রকাশিত যে কোন কোষগ্রন্থের তুলনায় 'বঙ্গীয় মহাকোষ' সর্বক্ষেত্রেই শ্রেষ্ঠ, উন্নততর, একক এবং অদ্বিতীয় এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই।

অমূল্যচরণ তাঁর অগাধ জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য, অতুলনীয় বিদ্যাবত্তা ও মনীষার পরিচায়ক অনেকগুলি অমূল্য গ্রন্থরাজি রচনা করে গিয়েছেন। তাঁর গ্রন্থগুলির মধ্যে সরস্বতী, (১৩৪০), 'লক্ষ্মী ও গণেশ' (১৩৭০) প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতি ও সাহিত্য (১৩৬৯), ভারত সংস্কৃতির উৎসধারা (১৩৭২), The Theatre of the Hindus (1955) ও 'মহাভারতের কথা' (১৩৪৭) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এগুলি ছাড়া তিনি

কয়েকখানি স্কুলপাঠ্য উপাদেয় গ্রন্থ রচনা করে গিয়েছেন। তাঁর জীবদ্দশায় প্রকাশিত 'সরস্বতী' একধারে দার্শনিক তান্ত্রিক, প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক আলোচনা ও গবেষণাপূর্ণ এবং কৌতূহলোদ্দীপক দুর্লভ তথ্য ও তত্ত্বের সমাবেশে অতুলনীয়। তার এই উপাদেয় গ্রন্থ সম্বন্ধে বিশ্ববিশ্রুত পণ্ডিত সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখেছেন, "এই ধরণের বই বাংলা ভাষায় এই সর্ব্বপ্রথম প্রকাশিত হইল এবং মনে হয় কিছুকাল ধরিয়া এই বই একক ও অদ্বিতীয় হইয়া থাকিবে। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের নানামুখী আলোচনা ও গবেষণার সহিত বাঙ্গালী পাঠক সুপরিচিত। ইনি বঙ্গ ভাষায় গবেষণার একটি অভিনব ধারার প্রবর্তন করিয়াছেন। সরস্বতী পুস্তকে শাস্ত্র ও শিক্ষা উভয় অবলম্বন করিয়া দেবতত্ত্ব বিচারিত হইয়াছে, শ্রীযুক্ত বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের উদ্যম বিশেষভাবে প্রশংসনীয়।

অমূল্যচরণ ঐকান্তিক নিষ্ঠা অতুলনীয় পাণ্ডিত্য ও সবিশেষ যোগ্যতার সঙ্গে অনেকগুলি অমূল্য গ্রন্থ সম্পাদনা করে গিয়েছেন। শ্রীশ্রীসংকীর্তনামৃত (১৩৩৬), 'বিদ্যাবতী' (১৯৩৪), শ্রীকৃষ্ণ বিলাস (১৩২৬), শ্রীকৃষ্ণ কণামৃতম্ (১৩১৯) এবং ইংরেজী ভাষায় 'জৈন জাতক' ভক্তমালা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। গ্রন্থগুলি সম্পাদনে তার মননশীলতা, পাণ্ডিত্য, গবেষণা এবং রসবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। সে যুগের সুধী মনীষী বিদ্বজন মাসিক সাপ্তাহিক পত্র পত্রিকা এক বাক্যে অকুণ্ঠ চিত্তে তার সম্পাদনার সুখ্যাতি করেন।

অমূল্য চরণের প্রতিভাদীপ্ত পাণ্ডিত্যের স্বীকৃতি স্বরূপ বিভিন্ন সময়ে তাঁকে বিভিন্ন গৌরবজনক পদে অধিষ্ঠিত হতে হয়েছে। তিনি সুদীর্ঘ আট বছর (১৯১৭-২৪) ত্রিপুরারাজ্যের রাজ-ঐতিহাসিক ছিলেন। তিনি ১৩১৯ সালে মালদহ সাহিত্য সম্মেলনের মূল সভাপতি, ১৩২৭ সালে শান্তিপুর সাহিত্য সম্মেলনের মূল সভাপতি, ১৩৪২ সনে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের (অধুনা নিখিল ভারত) মূল সভাপতি, ১৩৩৪ সনে বিহার সাহিত্য সম্মেলনের দর্শন শাখার সভাপতি, হিনু (রাঁচি) প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের মূল সাহিত্য শাখার সভাপতি, মেদিনীপুর সাহিত্য সম্মেলনের সাহিত্য শাখার সভাপতির আসন অলংকৃত করেন। ১৩২২ সালে

গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মেলনের তিনি হলেন সম্পাদক (১৯১৫-১৬), (১৯২০-২৭)। ১৩৩৪ সনে তিনি বিবেকানন্দ সোসাইটির কার্যকরী সমিতির সদস্য, ১৩৪৩ সনে প্রথম ভারতীয় সংস্কৃতি সম্মেলনের সংস্কৃত শাখার এবং পরের বছর ভারত সংস্কৃতি সম্মেলনের বাংলা বিভাগের সভাপতি এবং ১৩৪৫ সনে ফরিদপুর হিন্দু মহাসম্মেলনে তিনি মূল সভাপতির আসন অলংকৃত করেন। এ ছাড়া তিনি গুরুদাস রৌপ্যপদক এবং হেমচন্দ্র স্বর্ণপদক প্রাপক নির্বাচনের পরীক্ষক ছিলেন। তিনি সুদীর্ঘ পঁয়ত্রিশ বছর রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গলের সদস্য ছিলেন। রবিবাসরের সঙ্গেও তিনি যুক্ত ছিলেন। তিনি যথাযোগ্যতার সঙ্গে স্বীয় পদের মর্যাদা রেখে যথা কর্তব্য সম্পাদনে ত্রুটি করেন নি।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গেও তিনি ঘনিষ্টভাবে সংযুক্ত ছিলেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের জগত্তারিনী স্বর্ণপদক প্রদান কমিটি পরিভাষা কমিটি ও বানান সংস্কার সমিতির সদস্য ছিলেন। দীর্ঘকাল তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা এবং পালির প্রশ্নকর্তা ও পরীক্ষক ছিলেন।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সঙ্গে তিনি সুদীর্ঘ কাল ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত ছিলেন। ১৩১০ সালে এই যোগসূত্রের সূচনা। সেই থেকে এই প্রতিষ্ঠানের নানা বিভাগে কর্মকর্তারূপে এই মহান প্রতিষ্ঠানের উন্নতি সাধনে নিজেকে নিয়োজিত করেন। ১৩৩০ সনে তিনি নির্বাচিত হলেন এর সম্পাদক (১৩৩০-৩৪, আবার ১৩৪২-৪৪), সহকারী সভাপতি মনোনীত হন ১৩৪০ থেকে ৪২। এছাড়া ১৩১০-১৩ তিনি ছিলেন এই প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাধ্যক্ষ; ১৩২৩ সালে ছাত্রাধ্যক্ষ। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ কর্তৃক আয়োজিত বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের ১৩শ অধিবেশনে (মেদিনীপুর ১-৩ বৈশাখ, ১৩২৯) তিনি ইতিহাস শাখার সভাপতির পদ অলংকৃত করেন। এই প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি কাজের সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। সে যোগাযোগ ছিল বাইরের লোক দেখানো নয় – সম্পূর্ণ আত্মিক যোগ।

প্রাচ্যবিদ্যার অনুশীলন ও সম্প্রসারণের জন্য ১৩৩৯ সালে কলকাতায় ইণ্ডিয়ান রিসার্চ ইন্সটিটিউট নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। এর শুরু থেকে

DO NOT COPY

অমূল্যচরণ অন্যতম প্রধান উদ্যোগী কর্মী ও কার্যকরী সমিতির সদস্য ছিলেন। এই সমিতির মুখপত্র 'শ্রীভারতী'র শুরু থেকে আমৃত্যু তিনি ছিলেন সম্পাদক। এই প্রতিষ্ঠান থেকেই তাঁর সম্পাদিত 'আপিশলীয় শিক্ষা' (১৩৪৬ বঙ্গাব্দ) গ্রন্থটি ও তাঁর পরিচালিত ও সম্পাদিত 'বঙ্গীয় মহাকোষ' গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়।

'বঙ্গীয় মহাকোষ' সম্পাদন কালে অমূল্য চরণকে অত্যধিক পরিশ্রম করতে হয়। এছাড়া ছিল তাঁর নিজের পঠন, পাঠন ও কলেজের অধ্যাপনা। সাহিত্য পরিষদে অধিষ্ঠিত পদের কর্তব্য কর্ম, বিভিন্ন সভা সমিতিতে বক্তৃতাদান প্রভৃতি সাধ্যাতীত পরিশ্রমের ফলে তাঁর স্বাস্থ্য ভীষণ ভাবে ভেঙ্গে যায়। সাহিত্য পরিষদের এক সভায় বক্তৃতাদান কালেই তিনি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। স্বাস্থ্যলাভের আশায় এবং সম্পূর্ণ বিশ্রামের জন্য তিনি নিজের বাসভবন ঘাটশীলাতে যান। কিন্তু হৃত স্বাস্থ্য আর পুনরুদ্ধার করতে পারেন নি। ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে এপ্রিল (১০ই বৈশাখ, ১৩৪৭ বঙ্গাব্দ) মঙ্গলবার তিনি পরলোক গমন করেন।

মানুষ হিসাবে অমূল্য চরণ ছিলেন অতি অমায়িক সাদাসিধা, সদা মিষ্টভাষী, সদা মৃদুহাস্যময়। অগাধ পাণ্ডিত্য ও বিরাট মনীষার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তাঁর চালচলনে, ভাবভঙ্গিতে, কথাবার্ত্তায় কোথাও এতটুকু পণ্ডিতীভাব প্রকাশের কোন প্রকার প্রচেষ্টা ছিল না। তার মত সরল প্রকৃতির, সহৃদয়, নিরহঙ্কার মানুষ সে যুগে অতি অল্পই ছিল। যারাই একবার তাঁর সংস্পর্শে এসেছেন, তারাই তার অমায়িক মধুরমিষ্ট ব্যবহারে ও অনাড়ম্বর সরল জীবন যাত্রায় মুগ্ধ বিস্মিত হয়ে তাঁকে ভালবেসে, তাঁর প্রতি শ্রদ্ধান্বিত না হয়ে পারেন নি। আচার্য সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করে লিখেছেন, "জ্ঞান ও বিনয়ের অবতার, সদাপরহিতে নিযুক্ত, অতি সরল ও অমায়িক চরিত্রের এই জ্ঞানতপস্বী তাঁহার নিজের জীবৎকালে বঙ্গ দেশে ও ভারতে নিরভিমান নিষ্কাম পাণ্ডিত্যের ও জনসেবার আদর্শরূপে আমাদের সমক্ষে বিরাজমান ছিলেন।"

অমূল্য চরণ মজলিসি রসিক মানুষ ছিলেন, নানারকম রসাল বৈঠকী গল্পে ও সরস সংলাপে সকলের চিত্তাকর্ষণ করে আসর সরগরম রাখতেন।

DO NOT COPY

একদিন গীতারত্ন জিতেনবাবু অমূল্য চরণের সান্ধ্য বৈঠকে এসেছেন। তাঁকে দেখেই অমূল্য চরণ বললেন, এস হে গীতার এই শ্লোকের ব্যাখ্যা করে দাও। এই বলে তিনি গীতার শ্লোকটি বললেন,

নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ।
মদ্‌ভক্তা যত্র তিষ্ঠন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ।।

গীতারত্ন যথা বিহিত সঠিক ব্যাখ্যা সুরু করলেন-

তাই শুনে হাসতে হাসতে তিনি বললেন, না, হল না, হল না, এর নতুন ব্যাখ্যা শোন-

এক গুরু আর এক শিষ্য। উভয়েই মদ্যপায়ী, কিঞ্চিৎ মদ্যপান করেই শিষ্য বললে, গুরুদেব, শাস্ত্র তো মদের পক্ষপাতি নয়, আমরা যে শাস্ত্র বিরোধী কাজ করছি।

গুরুদেব বললেন - কে বললে ? শাস্ত্রতত্ত্ব বোঝে কজন? আচ্ছা, গীতা অর্থাৎ হিন্দুর বাইবেল, এর চেয়ে তো আর বড় শাস্ত্র নেই, তাতেও মদের প্রশংসা আছে - মদের মাহাত্ম্য কথা বর্ণিত হয়েছে।

শিষ্য বললে- সে কি গুরুদেব? আমি যদিও সংস্কৃত জানি না, তবুও বাংলা গীতা পড়েছি - তাতে কোথাও তো মদের মাহাত্ম্য কথা বা প্রশংসা নেই?

এই কথা শুনে গুরু বললেন - চোখ খুলে পড়লে দেখতে পাবে। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন-

আমি বৈকুণ্ঠে থাকি না, তবে কোথায় থাকি? না, 'মদ্‌ভক্তা যত্র তিষ্ঠতি' অর্থাৎ মদের ভক্তরা যেখানে থাকেন, তত্র তিষ্ঠামি - সেইখানেই আমি থাকি। নারদ কিনা না-রদ, একথার কোন রদ নেই। তবেই বোঝ, ভগবানের শ্রেষ্ঠ ভক্ত কারা?

গীতার এই নতুন ব্যাখ্যায় শুধু গীতারত্ন জিতেনবাবুই নয়, সেদিন আসর শুদ্ধ সকলের অট্ট হাসিতে আসর মুখরিত হয়ে উঠেছিল।

পাশে বসে ছিলেন সাহিত্যিক চারুচন্দ্র মিত্র; তিনি বললেন, গীতারত্ন তোমার বই-এ এই নতুন ব্যাখ্যাটা সংযোগ করো।

DO NOT COPY

১০ই বৈশাখ, ১৩৪৮ ছয় ঘটিকায় (২৩শে এপ্রিল, ১৯৪১) মহাবোধি সোসাইটি হলে অমূল্য চরণের প্রথম বার্ষিক স্মৃতি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেই সভায় কবি প্যারীমোহন সেনগুপ্ত নিম্নলিখিত এতাবৎ অপ্রকাশিত 'অমূল্য –প্রশস্তি' কবিতাটি শ্রদ্ধান্বিত চিত্তে পাঠ করেন।

অমূল্য-প্রশস্তি

ওগো অমূল্য জ্ঞান ভান্ডার,
কত মণি ছিল তোমার মাঝে ;
সে মণি দীপ্তি টানিয়া আনিল
শত গুণী জনে তোমার কাছে।
তব উজ্জ্বল জ্ঞানের ভাষণ
অজ্ঞ হৃদয়ে প্রদীপ জ্বালে,
কত ইতিহাস, কত আখ্যান
আনিয়া তোমার পূজার থালে,
সেবিলে ভারতী চরণ নিয়ত,
জনে জনে দিলে জ্ঞানের সুধা;
তোমা বিনে আজ জ্ঞান ভিক্ষুর
মিটে নাকো মোটে চিত্ত ক্ষুধা।
নবীন ও প্রবীন ভাষার সেবক
লভিল তোমার সমান প্রীতি;
ছোটরে করনি অবহেলা কভু,
পোষিয়াছ নিতি উদার নীতি।
ওগো জ্ঞানী, গুণী, মিত্র পোষক
অতীত ভারত কীর্ত্তিবাহী
তব কীর্ত্তির কীর্ত্তন সাথে

DO NOT COPY

বঙ্গ ভারতী কীর্ত্তি গাহি।

বোধিসত্ত্বের অপেক্ষায় **সুনন্দন ঘোষ**

বোধিমণ্ডে বজ্রাধিষ্ঠান করে ধ্যান-নিরত সিদ্ধার্থ
ভীষণ সংগ্রামের শেষে কামলোক পার হয়ে পৌঁছেছিলেন বুদ্ধত্বে।

সেদিনের পরাভূত "দেবপুত্র মার" এখন আসীন সিংহাসনে।
প্রজ্ঞাহীন আসক্তি সম্ভোগ, লোভ, দ্বেষ, হত্যা, প্রতারণা ----

এই "অবুদ্ধ কল্পে"
প্রাণী আছে, প্রকৃতি আছে, বোধিবৃক্ষ আছে,
বিমুক্তি নেই, বোধিসত্ত্ব নেই।
রুদ্ধ নির্বাণের পথ।

তবু অন্ধকারে ঢাকেনি জীবন।
গোপনে হোমাগ্নি জ্বলছে গৃহে দেবালয়ে,
নীরবে অধীত হচ্ছে ত্রিশরণের মন্ত্র।
পূর্ণ বিকাশের শেষে
পঞ্চ মার-জয়ী
এক আলোকপ্রাপ্ত মানুষের আবির্ভাবের প্রত্যাশায়।

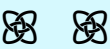

DO NOT COPY